ব্যাকরণ

ভাষা

❑ ভাষা :

আমি আমার মাকে ভালোবাসি।

উপরের বাক্যটিতে মায়ের প্রতি আমাদের ভালোবাসার কথা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের মনের এই ভাবটি কাউকে বোঝানোর জন্য আমরা তাকে কথাটি বলতে পারি বা লিখে বোঝাতে পারি। যেভাবেই তা করি না কেন উভয় ৰেত্রেই আমাদের কিছু ধ্বনি বা চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

- **মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যেসব অর্থবোধক ধ্বনি বা চিহ্ন ব্যবহার করে তাকে ভাষা বলে।**

যেমন– বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা, আরবি ভাষা ইত্যাদি।

❑ মাতৃভাষা :

I love my mother.

اَنَا اُحِبُّ اُمِّیْ। (আনা উহিব্বু উম্মি)

আমি আমার মাকে ভালোবাসি।

উপরে উলিৱখিত বাক্যগুলো লৰ কর। তিনটি বাক্যের অর্থ একই। প্রথম দুটি বাক্য আমরা সবাই ঠিকমতো বুঝতে নাও পারি। কিন্তু তৃতীয় বাক্যটি সহজেই বুঝতে পারছি। এর কারণ বাক্যটি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় লেখা হয়েছে।

- **মায়ের কাছ থেকে শিশু জন্মের পর যে ভাষা শেখে তা-ই তার মাতৃভাষা।** আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ইংরেজদের মাতৃভাষা ইংরেজি। আরবদের আরবি।

❑ ভাষার রূপ ও রীতি :

ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের দুটি উপায় রয়েছে। একটি কথা বলে, আরেকটি লিখে।

কথা বলার ভাষাকে বলা হয় কথ্য ভাষা। আর লেখার ভাষাকে বলে লেখ্য ভাষা। নিচের ছকটি লৰ করি :

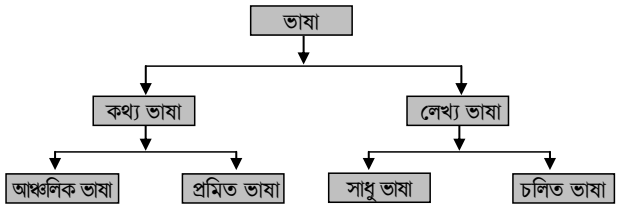

❑ আঞ্চলিক ভাষা ও প্রমিত ভাষা :

নিচের বাক্য দুটি খেয়াল করি :

ঔগ্‌গোয়া মাইন্‌য্যের দুয়া পোয়া আছিল্‌।
একজনের দুটো ছেলে ছিল।

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের রয়েছে নিজস্ব ভাষারীতি। এ রীতিকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা। প্রথম বাক্যটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষারীতি। আবার এই কথাটিই নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষেরা তাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলবে– 'অ্যাকজনের দুই হুত আছিল্‌।' আঞ্চলিক ভাষা একেক স্থানে একেক রকম বলে এক অঞ্চলের মানুষের পৰে অন্য অঞ্চলের ভাষা বোঝা কঠিন হয়। আবার উপরের দ্বিতীয় বাক্যটি এদেশের সব অঞ্চলের মানুষই বুঝতে পারবে। এভাবে সব ধরনের ভাষারীতিরই এমন একটি রূ প রয়েছে যেটির মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষের কাছেই মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এই রূ পটির নাম প্রমিত ভাষা।

❑ সাধু ও চলিত ভাষা :

নিচের বাক্য দুটি পড়ি–

তাহারা ফুল তুলিতেছে।
তারা ফুল তুলছে।

দুটি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য লৰ কর। প্রথম বাক্যের সর্বনাম পদ (তাহারা)–টির আকার দ্বিতীয় বাক্যের সর্বনাম পদ (তারা)–এর চেয়ে বড়। আবার প্রথম বাক্যের ক্রিয়াপদ (তুলিতেছে)–এর আকার দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়াপদ (তুলছে)–এর তুলনায় বড়। আকারে বড় অর্থাৎ প্রথম রূ পটির নাম সাধু ভাষা, আর আকারে ছোট অর্থাৎ দ্বিতীয় রূ পটির নাম চলিত ভাষা। সাধুভাষা মূলত ব্যবহার করা হয় সাহিত্য রচনায় বা বই পুস্তকে। কথা বলার জন্য আমরা সাধু ভাষা ব্যবহার করি না। চলিত ভাষাতেই আমরা সাধারণত কথা বলে থাকি। তবে বর্তমানে লেখালেখির ৰেত্রেও চলিত ভাষার ব্যবহারই বেশি চোখে পড়ে।

সাধু ভাষা : যে ভাষা সাধারণত সাহিত্য রচনায় ব্যবহার করা হয় বা বই–পুস্তকে লেখা হয়, তাকে সাধু ভাষা বলে।

চলিত ভাষা : যে ভাষায় আমরা সাধারণত কথা বলে থাকি, তাকে চলিত ভাষা বলে।

ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ

প্রতিটি ভাষাই শুদ্ধভাবে বুঝতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে হলে কিছু নিয়মকানুন জানতে হয়। এ নিয়মকানুনগুলোকে একসাথে বলা হয় **ব্যাকরণ**। বাংলা ভাষা শেখার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন।

- **যে নিয়মগুলো জানলে শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা বুঝতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে পারা যায়, সেগুলোকে একত্রে বাংলা ব্যাকরণ বলা হয়।**

ধ্বনি

বই = ব্ + অ + ই

লৰ কর, 'বই' একটি শব্দ। শব্দটিকে ভাগ করলে আমরা 'ব' এবং 'ই'–এ দুটি বর্ণ পাই। আরও ভাগ করলে পাই ব, অ এবং ই– এই ৩টি ধ্বনি। 'বই' শব্দটি উচ্চারণের সময় এ ধ্বনিগুলো আমাদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে। এগুলো হচ্ছে 'বই' শব্দের ক্ষুদ্রতম একক। অর্থাৎ এরপর শব্দটিকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না।

- **শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম হলো ধ্বনি।**

কথা বলার জন্য বা যে কোনো কিছু উচ্চারণের জন্য আমরা আমাদের কিছু অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের সাহায্য নিই। যেমন– কণ্ঠনালি, মুখগহ্বর, দাঁত, ঠোঁট, নাক, জিহ্বা ইত্যাদি। এই সবগুলোকে একসাথে বলা হয় বাগযন্ত্র। বাগযন্ত্রের সাহায্যে নানা রকম ধ্বনি তৈরি হয়। আমাদের উচ্চারিত আওয়াজগুলো বাগযন্ত্রে বাধা না পেলে সৃষ্টি হয় এক রকম ধ্বনি, আর বাধা পেলে সৃষ্টি হয় আরেক রকমের ধ্বনি।

❑ ধ্বনি দুই প্রকার– স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

তোমরা 'আ' এবং 'প' ধ্বনি দুটো উচ্চারণ কর। দেখবে 'আ' ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাস বাগযন্ত্রের কোথাও বাধা পাচ্ছে না। আবার লৰ কর, এই ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় এর সাথে অন্য কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে না। অর্থাৎ এই ধ্বনিটি অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে। এ ধরনের ধ্বনিকে বলা হয় স্বরধ্বনি।

- **যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাস বাগযন্ত্রের কোথাও বাধা পায় না এবং উচ্চারণের সময় অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য প্রয়োজন হয় না সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে।** উদাহরণ : অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

আবার লৰ কর, 'প' ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস বাধা পাচ্ছে। বাতাস এসে দুই ঠোঁটে আটকে যাচ্ছে। আরেকটি বিষয় দেখ, প = প্ + অ। 'প' ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় আমাদেরকে 'অ' ধ্বনিটিও উচ্চারণ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ উচ্চারণের ৰেত্রে অন্য একটি স্বরধ্বনির সাহায্য লাগছে। এ ধরনের ধ্বনির নাম হচ্ছে ব্যঞ্জনধ্বনি।

- **যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাস কোথাও না কোথাও বাধা পায় এবং উচ্চারণে স্বরধ্বনির সাহায্য প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।** উদাহরণ : ক, ঘ, চ, প ইত্যাদি।

বর্ণ

মানুষের মুখ থেকে বায়ু বের হওয়ার মাধ্যমে ধ্বনির সৃষ্টি। এগুলোর কোনো আকার নেই। এগুলো মানুষ কেবল মুখে উচ্চারণ করে ও কানে শোনে। ধ্বনিগুলোকে চেনার জন্য কিছু প্রতীক তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতীকের নাম **বর্ণ**। বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূ প।

- **ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলা হয়।**

যেমন : বই = ব + ই। এখানে 'ব' এবং 'ই' হলো বর্ণ।

বাংলা ভাষায় মোট ৫০টি বর্ণ আছে। সবগুলোকে একত্রে বলা হয় **বর্ণমালা**।

❑ বর্ণ দুই প্রকার– স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণগুলো স্বাধীন। অর্থাৎ স্বরবর্ণগুলো উচ্চারণে অন্য কোনো বর্ণের সাহায্য লাগে না।

- **যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে সেগুলোকে স্বরবর্ণ বলে।**

বাংলা বর্ণমালায় মোট ১১টি স্বরবর্ণ আছে। এগুলো হলো– অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

অন্যদিকে ব্যঞ্জনবর্ণগুলো উচ্চারণে স্বরবর্ণের সাহায্য প্রয়োজন হয়। যেমন– ক উচ্চারণ করতে ক–এর সাথে একটি অতিরিক্ত বর্ণ অ উচ্চারণ করতে হয়।

উদাহরণ : ক্ + অ = ক।

- **যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না সেগুলোকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।**

যেমন– ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি। বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

❑ যুক্তবর্ণ :

এক বর্ণের সাথে অন্য বর্ণ যুক্ত করে যুক্তবর্ণ গঠন করা হয়। যেমন– ক + ষ = ৰ, ত + ম = ত্ম ইত্যাদি।

যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দ দেখে নিই :

ৰ = ক + ষ – ৰমা	লৱ = ল + ল – উলৱাস
ব্দ = ব + দ – শব্দ	ন্ত = ন + ত – শান্ত
ল্প = ল + প – অল্প	ন্ধ = ন + ধ – বন্ধ

শব্দ

আমরা কথা বলার সময় অনেক রকম শব্দ উচ্চারণ করি। শব্দ তৈরি হয় কয়েকটি বর্ণের সংযোগের ফলে। কিন্তু লৰ কর :

ম + ল + ক = মলক

এখানে তিনটি বর্ণের সংযোগ ঘটেছে ঠিকই কিন্তু 'মলক' কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। তাই এটিকে কোনো শব্দ বলা যায় না।

আবার লৰ কর : **ক + ল + ম = কলম**

একই বর্ণগুলো মিলিত হয়ে একটি অর্থ প্রকাশ করেছে। তাই 'কলম' একটি শব্দ।

- **কতগুলো বর্ণ একত্রে মিলিত হয়ে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে ঐ বর্ণের সমষ্টিকে একত্রে শব্দ বলা হয়।**

বাক্য

কতগুলো শব্দ একসাথে মিলিত হয়ে একটি বাক্য গঠন করে।
এখন লৰ কর : **ভোরে ঘুম কামাল ওঠে থেকে।**

এখানে কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসলেও এটিকে একটি বাক্য বলা যায় না। কেননা শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে এখানে অর্থপূর্ণ কোনো মনের ভাব প্রকাশিত হয়নি। আবার দেখ :

কামাল ভোরে ঘুম থেকে ওঠে।

এৰেত্রে শব্দগুলো মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশে সৰম হয়েছে।

- **দুই বা ততোধিক শব্দ মিলিত হয়ে যখন মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন সেই শব্দগুচ্ছকে একত্রে বাক্য বলা হয়।**

পদ প্রকরণ

মনে কর, বাড়িতে মা নানা রকম পিঠা বানিয়েছেন। পুলি পিঠা, চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা ইত্যাদি। পিঠা খেয়ে আমরা বলি অনেক পদের পিঠা খেলাম। আমরা যে পিঠাগুলো খেলাম তার সবগুলো বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়। পিঠাগুলোর আকার, উপাদান ও স্বাদে আছে নানা বৈচিত্র্য। তেমনিভাবে একটি বাক্য যেসব শব্দ নিয়ে গঠিত হয় সেগুলোর মাঝেও থাকে নানা রকম বৈচিত্র্য।

নিচের বাক্যটি পড় :

সেলিম ও তার ভাই ফুটবল ভালো খেলে।

লৰ কর 'সেলিম' এবং 'ফুটবল' শব্দ দুটি দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বোঝাচ্ছে। 'ও' শব্দটি সেলিম ও তার ভাইয়ের মাঝে সম্পর্ক তৈরি করেছে। 'ভালো' শব্দটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি সেলিম ও তার ভাই খেলাধুলায় কেমন দৰ। আর 'খেলে' শব্দটি একটি কাজ সম্পর্কে বলছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই প্রতিটি শব্দেরই আছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য।

- **একটি বাক্য যেসব শব্দ দিয়ে গঠিত হয় তাদের প্রতিটিকে পদ বলা হয়।**

❑ **প্রকারভেদ :**
পদ পাঁচ প্রকার। যথা– ১. বিশেষ্য, ২. বিশেষণ, ৩. সর্বনাম, ৪. অব্যয় ও ৫. ক্রিয়া।

- **বিশেষ্য পদ :** যে পদ দিয়ে কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন– সুমন, ঢাকা, সূর্য ইত্যাদি।
- **বিশেষণ পদ :** যে পদ দিয়ে অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন– বুদ্ধিমান বালক, সুন্দর ফুল ইত্যাদি। এখানে 'বুদ্ধিমান' ও 'সুন্দর' হচ্ছে বিশেষণ পদ।
- **সর্বনাম পদ :** যে পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসে তাকে সর্বনাম পদ বলে। উদাহরণ– রাজু ভালো ছেলে। সে স্কুলে যায়। তার বয়স আট বছর। তাকে সবাই ভালোবাসে। এখানে 'রাজু'র পরিবর্তে সে, তার, তাকে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সর্বনাম পদ।
- **অব্যয় পদ :** যে পদের কোনো ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না তাকে অব্যয় পদ বলে। যেমন : মশা আর মশা। সে গরিব কিন্তু সৎ। এখানে 'আর', 'কিন্তু' হচ্ছে অব্যয় পদ।
- **ক্রিয়াপদ :** যে পদ দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। উদাহরণ – সে বাড়ি যাচ্ছে। রিমা ভাত খায়। এখানে 'যাচ্ছে', 'খায়' হচ্ছে ক্রিয়াপদ।

লিঙ্গ

বাবা, মা, শিশু, বাড়ি

উপরের শব্দগুলো লৰ কর। প্রতিটি শব্দেরই রয়েছে বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন : 'বাবা' বললে আমরা একজন পুরবষ মানুষকে বুঝি। 'মা' বললে একজন স্ত্রীলোক বা নারীকে বুঝি। 'শিশু' বললে আমরা ভেবে নিই ছেলে বা মেয়ে যে কোনো একটি হবে। আর প্রথম তিনটি শব্দ থেকে শেষ শব্দটি আরেকটি দিক থেকে আলাদা। তা হলো প্রথম তিনটি শব্দ জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সবারই জীবন আছে। আর শেষ শব্দটি জড়বস্তু, অর্থাৎ এর জীবন নেই। এবং এটি নারী–পুরবষ কোনোটিই বোঝায় না।

- **যেসব শব্দ দিয়ে আমরা নারী, পুরুষ অথবা নারী–পুরুষ দুটিকেই কিংবা এগুলোর কোনোটিকেই বুঝি না সেগুলোকেই লিঙ্গ বলা হয়।** লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা লৰণ।

❑ **প্রকারভেদ :** লিঙ্গ চার প্রকার। ১. পুংলিঙ্গ, ২. স্ত্রীলিঙ্গ, ৩. ক্লীবলিঙ্গ ও ৪. উভয় লিঙ্গ।

- **পুংলিঙ্গ :** যেসব শব্দ দিয়ে পুরবষ জাতি বোঝায়, সেগুলোকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন– বাবা, চাচা, ভাই, ছাত্র ইত্যাদি।
- **স্ত্রীলিঙ্গ :** যেসব শব্দ দিয়ে স্ত্রী জাতি বা নারী জাতি বোঝায়, সেগুলোকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন– মা, বোন, মামি, খালা, ছাত্রী ইত্যাদি।
- **উভয় লিঙ্গ :** যেসব শব্দ দিয়ে স্ত্রী–পুরবষ উভয়কেই বোঝায় সেগুলোকে উভয় লিঙ্গ বলে। যেমন– সন্তান, মানুষ, শিশু, বাছুর, পশু, বোকা ইত্যাদি।
- **ক্লীবলিঙ্গ :** যেসব শব্দ দিয়ে স্ত্রী–পুরবষ কোনোটাই না বুঝিয়ে জড় পদার্থ বোঝায়, সেগুলোকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন– বই, খাতা, কলম, টেবিল, চেয়ার, দরজা, পাথর ইত্যাদি।

❑ **লিঙ্গান্তর :**

পুংলিঙ্গ বা পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীবাচক শব্দে রূপান্তর করাকে লিঙ্গান্তর বা লিঙ্গ পরিবর্তন বলা হয়। নিচে লিঙ্গ পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ দেখানো হলো :

পুংলিঙ্গ		স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ		স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা	–	মা	ছাত্র	–	ছাত্রী
পুত্র	–	কন্যা	রাজা	–	রানি
ভাই	–	বোন	শিক্ষক	–	শিক্ষিকা
চাচা	–	চাচি	নর	–	নারী
মামা	–	মামি	খোকা	–	খুকি
নানা	–	নানি	চাকর	–	চাকরানি
দাদা	–	দাদি	সুন্দর	–	সুন্দরী
খালু	–	খালা	তরুণ	–	তরুণী
স্বামী	–	স্ত্রী	পাত্র	–	পাত্রী
নায়ক	–	নায়িকা	সিংহ	–	সিংহী
বৃদ্ধ	–	বৃদ্ধা	বাঘ	–	বাঘিনী

বচন

মনে কর, তুমি মাঠে একা দৌড়াচ্ছ। এক্ষেত্রে তুমি বলতে পার– 'আমি মাঠে দৌড়াচ্ছি।' আবার ধর তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে মাঠে দৌড়াচ্ছ। তখন বললে– 'আমরা মাঠে দৌড়াচ্ছি'। সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় 'আমি' পরিবর্তিত হয়ে 'আমরা' হয়ে গেল। এভাবে সংখ্যার ধারণা পাওয়ার নামই বচন।

- **যা দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলা হয়।**

  যেমন একটি কলম, কলমগুলো ইত্যাদি। এখানে 'একটি' ও 'গুলো' শব্দ দুটো দিয়ে কলমের সংখ্যা বোঝায়। সুতরাং **একটি** ও **গুলো** হচ্ছে বচন।

❑ প্রকারভেদ

বচন দুই প্রকার। ১. একবচন ও ২. বহুবচন।

- **একবচন :** যে শব্দ দিয়ে একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বোঝায় তাকে **একবচন** বলে। যেমন : কলম, মেয়ে, একখানা ইত্যাদি।
- **বহুবচন :** যে শব্দ দিয়ে একের বেশি ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায় তাকে **বহুবচন** বলে। যেমন : কলমগুলো, আমরা, মেয়েগুলো ইত্যাদি।

একবচন ও বহুবচনের কিছু উদাহরণ :

একবচন		বহুবচন	একবচন		বহুবচন
আমি	–	আমরা	কলম	–	কলমগুলো
তুমি	–	তোমরা	মানুষ	–	মানুষগুলো
আমার	–	আমাদের	পাখি	–	পাখিগুলো
সে	–	তারা	ছেলে	–	ছেলেগুলো
যে	–	যারা	শ্রমিক	–	শ্রমিকেরা
পর্বত	–	পর্বতমালা	দর্শক	–	দর্শকবৃন্দ
শিক্ষক	–	শিক্ষকমণ্ডলী	লেখক	–	লেখকগণ

সন্ধি

নিচের বাক্যটি লক্ষ কর :

হেমন্তে নবান্ন উৎসব হয়।

হেমন্ত ঋতুতে কৃষকের ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠে। নতুন ধান দিয়ে যে উৎসব হয় তারই নাম নবান্ন। 'নবান্ন' শব্দটিতে দুটি শব্দ যুক্ত অবস্থায় আছে 'নব' ও 'অন্ন'। 'নব' অর্থ– নতুন আর 'অন্ন' অর্থ – খাবার। লক্ষ কর, আমরা দ্রুত কথা বলার কারণে কখনো কখনো পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শব্দের ধ্বনি মিলে এক হয়ে যায়। কখনো কখনো সৃষ্টি হয় নতুন ধ্বনিও।

যেমন : নব = ন্ + অ + ব্ + অ
অন্ন = অ + ন + অ + ণ্ + অ

দুটি শব্দের শেষ ধ্বনি 'অ'। এখানে অ + অ = আ হয়ে গেছে। ফলে, নব + অন্ন = নবান্ন হয়েছে। একইভাবে বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় হয়েছে।

দ্রুত উচ্চারণের ফলে এভাবে পাশাপাশি ধ্বনির মিলে যাওয়াকেই সন্ধি বলা হয়। সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন।

- **পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনি মিলে যদি একটি ধ্বনির সৃষ্টি হয় তবে তাকে সন্ধি বলে।**

  সন্ধি দুটি উপায়ে হতে পারে :

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে **স্বরসন্ধি** বলে। যেমন– বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে **ব্যঞ্জন সন্ধি** বলে। যেমন– দিক্ + অন্ত = দিগন্ত।

❑ বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

ক. সন্ধি বাক্যকে সুন্দর ও মধুর করে।
খ. উচ্চারণকে সহজ করে।
গ. বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে।
ঘ. নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি করে।

❑ সন্ধিবিচ্ছেদ :

সন্ধির মাধ্যমে দুটি শব্দ একত্রিত হয়ে নতুন একটি শব্দ গঠন করে। সন্ধিযোগে গঠিত এই শব্দটির দুটি অংশ ভাগ করে দেখানোকেই সন্ধি বিচ্ছেদ বলা হয়। নিচে সন্ধি বিচ্ছেদের কিছু উদাহরণ দেখান হলো :

বিদ্যালয় = বিদ্যা + আলয়	পরীক্ষা = পরি + ইক্ষা
সিংহাসন = সিংহ + আসন	অতীত = অতি + ইত
সূর্যোদয় = সূর্য + উদয়	জলাশয় = জল + আশয়

ইত্যাদি = ইতি + আদি	নয়ন = নে + অন
দিগন্ত = দিক্ + অন্ত	নরাধম = নর + অধম
জীবাণু = জীব + অণু	প্রতিচ্ছবি = প্রতি + ছবি
উলাস = উৎ + লাস	উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
সংসার = সম্ + সার	সংবাদ = সম্ + বাদ

বিপরীত শব্দ

'বিপরীত' শব্দের অর্থ হচ্ছে– 'উল্টো'।

- **একটি শব্দ যখন অন্য একটি শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে তখন শব্দ দুটিকে পরস্পরের বিপরীত শব্দ বলে।**

যেমন : ভালো – মন্দ, সঠিক – ভুল, আসল – নকল, বড় – ছোট ইত্যাদি। নিচে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, (বিপরীতার্থক) এমন কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো :

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
পরিণত	অপরিণত	উপকার	অপকার
প্রথম	শেষ	পূর্ব	পশ্চিম
আপন	পর	প্রিয়	অপ্রিয়
বীর	ভিতু	স্বাধীন	পরাধীন
হাসি	কান্না	খুশি	অখুশি
নেই	আছে	জানা	অজানা
দেবে	নেবে	ঊর্ধ্ব	নিম্ন
রাঙা	তিমির	নবীন	প্রবীণ
সজীব	নির্জীব	নতুন	পুরাতন
শক্ত	নরম	ছাত্র	ছাত্রী
যুদ্ধ	শান্তি	দিন	রাত
থামা	চলা	নামা	ওঠা

সমার্থক শব্দ

'সমার্থক' বলতে বোঝায় একই অর্থ বিশিষ্ট। বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো একই অর্থ বোঝায়। যেমন : আকাশ, আসমান, গগন শব্দগুলোর অর্থ একই। অর্থাৎ এগুলো পরস্পরের সমার্থক। এমন আরও কিছু সমার্থক শব্দের উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ	মূল শব্দ	সমার্থক শব্দ
চোখ	নয়ন, আঁখি।	ফুল	পুষ্প, কুসুম।
পাখি	বিহঙ্গ, পৰী।	গাছ	তরব, বৃৰ।
রাজা	নৃপতি, দেশশাসক।	কন্যা	মেয়ে, জায়া।
অরণ্য	জঙ্গাল, বন।	ইচ্ছা	সাধ, আগ্রহ।
হুকুম	আদেশ, নির্দেশ।	রাষ্ট্র	দেশ, ভূখণ্ড।
সংগ্রাম	লড়াই, সমর।	গ্রাম	গাঁ, পলি+

খবর	সংবাদ, সন্দেশ।	হাত	হস্ত, পাণি।
দুশমন	শত্রব, অরি।	মা	জননী, মাতা।
স্কুল	বিদ্যালয়, পাঠশালা।	ইচ্ছা	সাধ, আগ্রহ।
অহংকার	দেমাগ, অহমিকা।	কথা	বচন, উক্তি।
অকুতোভয়	সাহসী, ভয়হীন।	বাবা	পিতা, জনক।

এককথায় প্রকাশ

নিচের অনুচ্ছেদটি লক্ষ কর :

লোকটি **চার রাস্তার** ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে। তার **মাথা থেকে পা পর্যন্ত** জলে ভেজা।

কথাগুলো আমরা এভাবেও বলতে পারতাম :

লোকটি **চৌরাস্তার** ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে। তার **আপাদমস্তক** জলে ভেজা।

এভাবে বললে অর্থেরও কোনো পরিবর্তন ঘটে না, বলতেও সহজ ও দ্রুত হয়।

কথা বলার সময় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বাক্য বা বাক্যাংশকে সংক্ষিপ্ত করে থাকি। বড় একটি বাক্য বা বাক্যাংশকে একটি শব্দে বা এককথায় বলি।

- **অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্য বা বাক্যাংশকে ছোট করে প্রকাশ করাকেই বলা হয় বাক্য সংকোচন বা এককথায় প্রকাশ।**

  নিচে এককথায় প্রকাশের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

  - পূর্ব দিকে আছে এমন দেশ – পূর্বদেশ।
  - যিনি কবিতা লেখেন – কবি।
  - বলবান ও সাহসী যিনি – বীর।
  - মায়ের কাছে শেখা ভাষা – মাতৃভাষা।
  - পছন্দ করা হয় এমন – প্রিয়।
  - গাছপালায় ভরা বনজঙ্গল – অরণ্য।
  - যে জিনিসে কোনো স্বাদ নেই – বিস্বাদ।
  - যে সেপাইয়ের সাথে বন্দুক থাকে – বরকন্দাজ।
  - খুব বেশি – বেজায়।
  - মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী – জনপ্রাণী।
  - বিপদের ভয়ে নীরব অবস্থা – থমথমে।
  - যার মৃত্যু নেই – অমর।
  - বাধা নিষেধ মানে না এমন – বেপরোয়া।
  - নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা – আত্মত্যাগ।
  - সুস্থ নয় যে – অসুস্থ।
  - ভয় নেই যার – অকুতোভয়।
  - কবরে শায়িত – সমাহিত।
  - একটুও না থেমে – অনবরত।
  - বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ – বীরশ্রেষ্ঠ।
  - কাছাকাছি বসবাস করে যারা – প্রতিবেশী।
  - কাপড় বোনে যে – তাঁতি।
  - শিল্প চর্চা করেন যিনি – শিল্পী।
  - পাখির শরীর বা পাখার আবরণ – পালক।
  - মাথার ওপরে গোছা করে বাঁধা চুল – ঝুঁটি।
  - গ্রামের সাধারণ ছবি আঁকিয়ে – পটুয়া।
  - ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী ছেলে – কিশোর।
  - দেশসেবায় যারা ব্রত পালন করে – ব্রতচারী।
  - চিত্রের কাঠামো – নকশা।
  - স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শারীরিক কসরত – ব্যায়াম।

বাগধারা

নিচের বাক্যটি লক্ষ কর :

সেলিম অগাধ জলের মাছ।

প্রশ্ন জাগতে পারে, একজন মানুষ কীভাবে অগাধ অর্থাৎ গভীর জলের মাছ হতে পারে। আসলে এখানে 'অগাধ জলের মাছ' কথাটি একটি বিশেষ অর্থ বোঝাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে– 'সুচতুর ব্যক্তি'। বাংলা ভাষায় এ রকম কিছু শব্দগুচ্ছ আছে যেগুলো বাক্যে বসে, যা লেখা থাকে তা না বুঝিয়ে অন্য একটি বিশেষ অর্থকে বোঝায়। এ ধরনের শব্দগুচ্ছ 'বাগধারা' নামে পরিচিত।

❑ **নিচে কতগুলো বাগধারা ও বাক্যে তাদের প্রয়োগ দেখানো হলো :**

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – ভিক্ষুকটির অরণ্য রোদনে কেউ সাড়া দিল না।

অক্কা পাওয়া (মরে যাওয়া) – গণপিটুনিতে পকেটমার অক্কা পেল।

অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা) – বেয়াদব ছেলেটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।

অগাধ জলের মাছ (সুচতুর ব্যক্তি) – চৌধুরী সাহেব অগাধ জলের মাছ।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – তুমি হলে আমড়া কাঠের ঢেঁকি, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।

আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) – না বুঝে কাজ করলে আক্কেল সেলামি দিতে হয়।

উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) – উড়নচণ্ডী লোকদের ভবিষ্যৎ ভালো নয়।

ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) – ফরহাদ ইঁদুর কপালে, তাই এত পড়েও পাস করল না।

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) – ছেলেটা ইঁচড়ে পাকা বলেই বড়দের সঙ্গে অমন করে তর্ক করছে।

এলাহি কাণ্ড (বিরাট ব্যাপার) – এত সব আয়োজন! মনে হচ্ছে কোনো এলাহি কাণ্ড ঘটেছে।

কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) – চোরটার কৈ মাছের প্রাণ, গণপিটুনি খেয়েও বেঁচে গেল।

গোঁফ খেজুরে (অলস) – গোঁফ খেজুরে মানুষের উন্নতি হয় না।

গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল) – এ অঙ্ক মিলবে না, কারণ গোড়াতেই তো গলদ রয়েছে।

ঘোড়ার ডিম (অবাস্তব বস্তু) – পড়াশোনা না করলে পরীক্ষায় ঘোড়ার ডিম পাবে।

চোখের বালি (অপ্রিয়/ চক্ষুশূল লোক) – মা-মরা ছেলেটি সৎ মায়ের চোখের বালি।

চোখের মণি (অতি প্রিয়) – একমাত্র ছেলেটি মায়ের চোখের মণি।

ঠোঁটকাটা (স্পষ্টভাষী) – ঠোঁটকাটা লোকেরা সবকথা সামনাসামনিই বলে।

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) – চাকরি পেয়ে রফিক ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে, দেখাই পাওয়া যায় না।

থ বনে যাওয়া (স্তম্ভিত হওয়া) – তার কাণ্ড দেখে আমরা থ বনে গেলাম।

দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – আমার সঙ্গে কবিরের খুব দহরম মহরম।

দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – টাকা থাকলে দুধের মাছির অভাব হয় না।

পটল তোলা (মারা যাওয়া) – অনেক দিন অসুস্থ থাকার পর লোকটি পটল তুলল।

ভরাডুবি (সর্বনাশ) – দোকানে আগুন লেগে ফজলু মিঞার ভরাডুবি হয়েছে।

ভিজে বিড়াল (কপটচারী, ভণ্ড) – সে একজন ভিজে বেড়াল, তাকে চেনা সহজ নয়।

হ–য–ব–র–ল (বিশৃঙ্খলা) – জিনিসপত্র ছড়িয়ে ঘরটাকে তো একেবারে হ–য–ব–র–ল করে রেখেছে।

হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) – এ টাকাগুলোই আমার হাতের পাঁচ।

বিরামচিহ্ন

মানুষ একটানা কথা বলতে পারে না। তাই তাকে মাঝে মাঝে থামতে হয়। তা ছাড়া অন্যকে কথাগুলো বোঝার সময়ও দিতে হয়। লেখার বেলায়ও তেমনি মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হয়। লেখা থামাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয় নানা রকম চিহ্ন বা সংকেত। এই চিহ্ন বা সংকেতই বিরামচিহ্ন। একে যতি বা ছেদ–চিহ্নও বলা হয়ে থাকে। বিরামচিহ্ন ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয়।

- **লিখিত বাক্যে অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে মানুষের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যক্ত করার জন্য যে চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বিরামচিহ্ন বলে।**

নিচে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বিরামচিহ্নের নাম, আকৃতি নির্দেশ করা হলো :

বিরামচিহ্নের নাম	আকৃতি
কমা	,
সেমিকোলন	;
দাঁড়ি	।
জিজ্ঞাসাচিহ্ন	?
বিস্ময়চিহ্ন	!
কোলন	:
কোলন ড্যাশ	:-
ড্যাশ	——
হাইফেন	-
উদ্ধরণচিহ্ন / উদ্ধৃতিচিহ্ন	“ ”
বন্ধনী চিহ্ন	( ), { }, [ ]
বিকল্প চিহ্ন	/
ইলেক / লোপচিহ্ন / ঊর্ধ্বকমা	’

চিঠিপত্র লিখন

❑ চিঠি বা পত্র

চিঠির আভিধানিক অর্থ হলো স্মারক বা চিহ্ন। তবে ব্যবহারিক অর্থে চিঠি বা পত্র লিখন বলতে বোঝায়, একের মনের ভাব বা বক্তব্যকে লিখিতভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানোর বিশেষ পদ্ধতিকে। আরও সহজ করে বলা যায়, দূরের কিংবা কাছের কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিজের প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখে জানানোর পদ্ধতিকে চিঠি বা পত্র লিখন বলে।

❑ চিঠি বা পত্রের বিভিন্ন অংশ

একটি চিঠি বা পত্রে সাধারণত ছয়টি অংশ থাকে। এগুলো হলো– ১. যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম ও তারিখ; ২. সম্বোধন বা সম্ভাষণ; ৩. মূল বক্তব্য; ৪. বিদায় সম্ভাষণ; ৫. প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) স্বাৰর ও ৬. প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা।

❑ চিঠি বা পত্র লেখার নিয়ম

চিঠি বা পত্র লেখার সময় সাধারণ কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন– ১. সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তাৰরে লেখা; ২. সহজ, সরল ভাষায় লেখা; ৩. নির্ভুল বানানে লেখা; ৪. চলিত ভাষায় লেখা; ৫. বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করা; ৬. একই কথার পুনরাবৃত্তি না করা; ৭. পাত্রভেদে সম্মান ও স্নেহসূচক বাক্য ব্যবহার ইত্যাদি।

❑ চিঠি বা পত্রের প্রকারভেদ

বিষয়বস্তু বিবেচনায় চিঠিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ব্যক্তিগত চিঠি। যেমন– মা–বাবা বা বন্ধু–বান্ধবকে ব্যক্তিগত বিষয় উলেৱখ করে লেখা চিঠি।
২. সামাজিক চিঠি। যেমন– সামাজিক কোনো সমস্যা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কিংবা প্রশাসনকে জানানোর জন্য লেখা চিঠি।
৩. ব্যবহারিক চিঠি। যেমন– ব্যবহারিক প্রয়োজনে লেখা আবেদনপত্র, ব্যবসাপত্র, নিমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত পত্র

১. মনে কর, তোমার নাম তরু/তারা। গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ। ধর, তোমার বন্ধুর নাম সুজলা/সজল।

২০.০১.২০১৭
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

প্রিয় সজল,

ভালো আছো তুমি? আমি ভালো আছি।

আজ ক্লাসে স্যারের কাছ থেকে গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারলাম। গাছ খাদ্য, কাঠ, অক্সিজেন ইত্যাদি দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। পরিবেশের ভারসাম্য রৰায়ও গাছের অনেক দরকার আছে। তাই আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগানো উচিত।

বাড়ির সামনের উঠোনে বাবা আর আমি অনেকগুলো চারা লাগিয়েছি। তুমিও তোমাদের বাড়িতে ফল ও কাঠ গাছের চারা লাগিও। আমাকে চিঠি লিখে জানিও।

ইতি
তোমার বন্ধু
তারা

২. মনে কর, তোমার নাম তমা। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে তোমার বিদেশি বন্ধুকে একটি পত্র লেখ। ধর, তোমার বন্ধুর নাম শাওন।

১৩ই জানুয়ারি, ২০১৭

কুমিলা–

প্রিয় শাওন,

কেমন আছো? আমি ভালোই আছি। আজকে আমি তোমাকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলব।

আমাদের দেশের প্রকৃতি অনেক সুন্দর। চারদিকে সবুজের সমারোহ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, ঝরনা, বন সবকিছুই আছে আমাদের দেশে। বছরে ছয়টি ঋতু যাওয়া-আসা করে। সে কারণে দেশটির রূ প আরও বেড়েছে। রূ পের দিক থেকে বাংলাদেশ সকল দেশের রানি।

অনেক দিন তোমার কোনো চিঠি পাই না। আমাকে তোমার বনভোজনের কথা বলবে না? ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বন্ধু
তমা

৩. মনে কর, তোমার নাম মানিক। তোমার বন্ধুর নাম রিয়াজ। সম্প্রতি তোমার এলাকায় ঘটে যাওয়া একটি সড়ক দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
১৪ই মার্চ, ২০১৭

প্রিয় রিয়াজ,
শুভেচ্ছা নিও। কেমন আছ?
কয়েকদিন আগে আমার চোখের সামনে একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তখন বিকেল প্রায় চারটা। স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছি। একটি অল্পবয়সী ছেলে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। কাছেই ফুট-ওভারব্রিজ থাকলেও ছেলেটি তা ব্যবহার করছিল না। হঠাৎ তাড়াহুড়ায় রাস্তা পার হওয়ার সময় উল্টোদিক থেকে একটি বাস এসে তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল। ঘটনাস্থলেই ছেলেটির মৃত্যু হলো। রক্তে রাজপথ ভেসে যাচ্ছিল। ছেলেটিকে দেখে চেনার কোনো উপায় ছিল না। চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। দ্রবত বাড়িতে ফিরে এলাম।
ভালো থেকো। রাস্তা পারাপারে সব সময় সাবধান থাকবে। চাচা–চাচিকে আমার সালাম জানিও।

ইতি
তোমার বন্ধু
মানিক

৪. মনে কর, তোমার বন্ধুর নাম জামাল। তোমার নাম কামাল। ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দের কথা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

মাছিমপুর, নরসিংদী
২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭

প্রিয় জামাল,
ভালো আছো তো? আজকে তোমাকে বলব ঘুড়ি ওড়ানোর কথা।
গত কয়েকদিন বাড়ির সামনের খোলা মাঠে বন্ধুদের নিয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছি। বিকেল হতেই ছুটে যাই মাঠে। আমি শক্ত হাতে নাটাইটা ধরে রাখি। একজন বাতাসের উল্টোদিকে গিয়ে ঘুড়িটি উড়িয়ে দেয়। সুতোয় টান দিলে ঘুড়ি হোঁচট খায়। তখন তাকে সামলে রাখা ভারি মুশকিল হয়ে পড়ে। সুতোর সাথে সুতোর প্যাঁচ লেগে অনেকের ঘুড়ি কেটে যায়। পরে তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।
ঘুড়ি ওড়ানো সত্যিই খুব মজার। ছুটি কেমন কাটছে? চিঠি লিখে জানিও। আজকের মতো বিদায়।

ইতি
তোমার বন্ধু
কামাল

৫. মনে কর, তোমার বন্ধুর নাম জুঁই। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কথা জানিয়ে তাকে একটি পত্র লেখ।

তেরখাদা, খুলনা
২৮শে জানুয়ারি, ২০১৭

প্রিয় জুঁই,
কেমন আছ? আজ তোমাকে বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কথা জানিয়ে লিখছি।
গত সোমবার আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি মনে রাখার খেলা, ১০০ মিটার দৌড় ও অঙ্ক দৌড়– এ তিনটি খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। প্রথম দুটিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে পারলেও শেষটিতে কোনো পুরস্কার পাইনি।
আজ এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো।

ইতি
তোমার প্রিয় বন্ধু
ঈশিতা

৬. মনে কর, তোমার নাম শফিক। তোমার বাবা চট্টগ্রামে চাকরি করেন। বার্ষিক পরীক্ষার জন্য কেমন প্রস্তুতি নিয়েছ তা জানিয়ে তোমার বাবাকে একটি চিঠি লেখ।

ছয়সূতী, কিশোরগঞ্জ
০৭/১১/২০১৭

শ্রদ্ধেয় বাবা,
আস্সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? ২০ তারিখ থেকে আমার বার্ষিক পরীৰা শুরব হবে। আমার প্রস্তুতি খুব ভালো। ইংরেজি ও গণিতে এখন আর কোনো সমস্যা নেই। দোয়া করবেন, এবারও যেন প্রথম হতে পারি।
আমরা সবাই ভালো আছি। আপনার ছুটি হবে কবে? পরীৰার পর আপনাকে ছাড়া একদম ভালো লাগবে না। তাড়াতাড়ি চলে আসবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
শফিক

৭. মনে কর, তোমার নাম রাকীবা এবং তোমার বান্ধবীর নাম তাহমিনা। তোমার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল কেমন হয়েছে তা জানিয়ে বান্ধবীকে একটি পত্র লেখ।

মাছিমপুর, নরসিংদী
০১/০১/২০১৭

প্রিয় তাহমিনা,
শুভেচ্ছা। ভালো আছ তো? আমি ভালো আছি। আমার বার্ষিক পরীৰার ফলাফল জেনে তুমি খুবই খুশি হবে। প্রতিবারের মতো এবারও আমি প্রথম হয়েছি। তোমার পরীৰার ফলাফল জানতে চাই। চিঠি দিও তাড়াতাড়ি।
আজ আর লিখব না। ভালো থেকো। চাচা–চাচিকে আমার সালাম দিও।

ইতি
তোমার বান্ধবী
রাকীবা

৮. মনে কর, তোমার নাম খসরু। তোমার বড় বোনের বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে। তোমার প্রিয় বন্ধু হামিদকে এ উপলক্ষ্যে একটি চিঠি লেখ।

পূর্ব ঘোপাল, ফেনী
২৫শে মার্চ, ২০১৭

প্রিয় হামিদ,
শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছ। আগামী ১০ই এপ্রিল আমার বড় আপার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। তুমি অবশ্যই আসবে। মা, আপা

সবাই তোমাকে আসতে বলেছেন। তুমি কিন্তু ৭ তারিখের মধ্যেই চলে এসো, কেমন?

আজকের মতো বিদায়। সাবধানে এসো।

ইতি
তোমার বন্ধু
খসরব

আবেদনপত্র

১. মনে কর, তোমার নাম সেলিম চৌধুরী। তোমার বিদ্যালয়ের নাম জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অসুস্থতার জন্য তুমি তিন দিন বিদ্যালয়ে যেতে পারনি। অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

২৪/০৪/২০১৭

বরাবর
প্রধান শিৰক
জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ছাগলনাইয়া, ফেনী

বিষয় : অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে আমি গত ২১/০৪/২০১৬ থেকে ২৩/০৪/২০১৬ এ তিন দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
সেলিম চৌধুরী
শ্রেণি–৩য়, রোল–৭

২. মনে কর, তুমি রোকাইয়া শশী। আগামী ২৫শে জুন তোমার বড় বোনের বিয়ে। এ উপলক্ষ্যে চার দিনের অগ্রিম ছুটি চেয়ে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

২১/০৬/২০১৭
বরাবর
প্রধান শিৰক
ছয়সূতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

বিষয় : অগ্রিম ছুটির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আগামী ২৫শে জুন আমার বড় বোনের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই আমার ২২শে জুন থেকে ২৫শে জুন পর্যন্ত মোট ৪ দিনের ছুটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উক্ত ৪ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আপনার অনুগত ছাত্রী
রোকাইয়া শশী
তৃতীয় শ্রেণি, শাখা–ক
রোল–০১

৩. মনে কর, তুমি মুহম্মদনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণির ছাত্র। বিদ্যালয়ে আসার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছ। এ অবস্থায় তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। ধর, তোমার নাম মোঃ হাসান।

১৭/০৫/২০১৭

বরাবর
প্রধান শিৰক
মুহম্মদনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মুহম্মদনগর, সিলেট।

বিষয় : তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটির জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আজ বিদ্যালয়ে আসার পর থেকে আমার প্রচণ্ড পেটব্যথা হচ্ছে। এ কারণে আমি ক্লাসগুলোতে মনোযোগ দিতে পারছি না।

অতএব, দয়া করে আমাকে তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটি দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত
মোঃ হাসান
তৃতীয় শ্রেণি, শাখা– ক
রোল–১০

ফরম পূরণ

১. মনে কর, তুমি ঘোপাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাও। এখন প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে নিচের ফরমটি পূরণ কর।

উত্তর :

ঘোপাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ছাগলনাইয়া, ফেনী

ভর্তি ফরম

১। নাম : আফসান ইসলাম
২। মায়ের নাম : নূরজাহান বেগম
৩। পেশা : গৃহিণী
৪। বাবার নাম : মফিজুল ইসলাম
৫। পেশা : চাকরি
৬। জন্ম তারিখ : ০৪-০৪-২০০৭
৭। যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক : ৩য়
৮। বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : চাঁদগাজী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯। অভিভাবকের ফোন/ মোবাইল নম্বর : ০১৭.....
১০। বর্তমান ঠিকানা : ৪০ কলেজ রোড, ছাগলনাইয়া, ফেনী
১১। স্থায়ী ঠিকানা : পূর্ব ঘোপাল, ছাগলনাইয়া, ফেনী

আফসান ০১/০১/২০১৬

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ ..... প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখ

২. মনে কর, তুমি তোমার বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চাও। এখন প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে নিচের ফরমটি পূরণ কর।

উত্তর :

লিটল বার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতার ফরম

প্রতিযোগীর নাম : সৈয়দ হাসান
শ্রেণি ও রোল নং : তৃতীয়, ০৭
জন্ম তারিখ : ০১-০৯-২০০৭
যেসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক [সর্বোচ্চ তিনটি] : (ক) ১০০ মিটার দৌড়
(খ) দীর্ঘ লাফ
(গ) ব্যাঙলাফ
অভিভাবকের ফোন নম্বর : ০১৩১৩৩০৫৩০৭ (মোবাইল)

হাসান *সৈয়দ আমীন*

প্রতিযোগীর স্বাক্ষর ..... অভিভাবকের স্বাক্ষর ..... ক্রীড়া শিক্ষকের স্বাক্ষর

৩. মনে কর, তুমি একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এ জন্য একটি নিবন্ধন ফরম পূরণ কর।

উত্তর : সমাজ উন্নয়ন সংঘ
উকিলপাড়া, জামালপুর।

স্বাধীনতা দিবস চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা-২০১৬

নিবন্ধন ফরম

১। প্রতিযোগীর নাম : সামিউল হক
২। জন্ম তারিখ : ১৭-০৩-২০০৭
৩। অভিভাবকের নাম : আবুল হক
৪। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম : ছনচারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫। শ্রেণি : ৩য়
৬। জাতীয়তা : বাংলাদেশি
৭। যোগাযোগের ঠিকানা : ৪৩৮ উকিলপাড়া, জামালপুর
৮। প্রিয় চিত্রশিল্পী : কামরুল হাসান
৯। মোবাইল/টেলিফোন নম্বর : ০১৩১৪৭৮২৩৫৪

সামিউল হক *আবুল হক*

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ..... অভিভাবকের স্বাক্ষর ..... পরিচালকের স্বাক্ষর

প্রবন্ধ রচনা

❑ **প্রবন্ধ কী :**
কোনো একটি বিষয়কে ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়ে ভাষায় প্রাণবন্ত করে প্রকাশ করাই হচ্ছে প্রবন্ধ।

❑ **প্রবন্ধের প্রকারভেদ :**
বিষয়ভেদে প্রবন্ধকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা– ১. বর্ণনামূলক; ২. ঘটনামূলক ও ৩. চিন্তামূলক।

❑ **প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন :**

প্রবন্ধ রচনার সময় কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাহলে প্রবন্ধের মান বৃদ্ধি পায় এবং পরীৰায় অধিক নম্বর পাওয়া যায়। এৰেত্রে–

১. প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।
২. চিন্তাপ্রসূত ভাবগুলো অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে।
৩. প্রত্যেকটি ভাব উপস্থাপন করতে হবে পৃথক অনুচ্ছেদে।
৪. একই ভাব, তথ্য বা বক্তব্য বারবার উলেৱখ করা যাবে না।
৫. রচনার ভাষা হতে হবে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।
৬. উপস্থাপিত তথ্যাবলি অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে।
৭. বড় ও জটিল বাক্য যতটা সম্ভব পরিহার করতে হবে।
৮. নির্ভুল বানানে লিখতে হবে।
৯. সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটানো যাবে না।
১০. উপসংহারে সুচিন্তিত নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করতে হবে।

১. আমাদের এই বাংলাদেশ

সূচনা : 'সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।'

সুজলা–সুফলা, শস্য–শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। সবুজে ঘেরা, পাখি ডাকা দেশটির রূ পের কোনো শেষ নেই। কবির দেশ, বীরের দেশ, গানের দেশ, মায়ের দেশ– এরকম অনেক নামে এ দেশকে ডাকা হয়।

অবস্থান : বাংলাদেশ দৰিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। এর সীমান্তের অধিকাংশ জুড়ে আছে ভারত। আর সামান্য অংশে মিয়ানমার। দৰিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।

স্বাধীনতা লাভ : ১৯৭১ সালে এক রক্তৰয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

জনসংখ্যা : জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি।

ভাষা : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এদেশে অনেক জাতি–গোষ্ঠীর লোক বাস করে। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা। তবে বাংলা–ই আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

ভূ–প্রকৃতি : বাংলাদেশের প্রায় সবটাই সমভূমি। সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিলৱার কিছু অংশে পাহাড় রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শত–সহস্র আঁকাবাঁকা নদ–নদী।

ঋতুবৈচিত্র্য : বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। প্রতি দুই মাসে একটি করে ঋতুর পালাবদল ঘটে। একেক ঋতুতে প্রকৃতি একেক সাজে সেজে ওঠে। প্রতিটি ঋতুর সৌন্দর্যই অতুলনীয়। এদেশের অপরূ প প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মূল কারণ এই ঋতুবৈচিত্র্য।

জনজীবনের বৈচিত্র্য : বাংলাদেশে আছে নানা ধর্মের, নানা পেশার লোকজন। বাঙালি ছাড়াও দেশে বিভিন্ন জাতি–গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। তাদের আছে নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতি। সব ধরনের মানুষ এদেশে মিলেমিশে থাকে।

প্রাকৃতিক সম্পদ : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। গ্যাস আমাদের প্রধান সম্পদ। এছাড়াও রয়েছে কয়লা, চুনাপাথর প্রভৃতি।

উপসংহার : বাংলাদেশ আমাদের গর্ব ও অহংকার। দেশকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি।

২. গরু

সূচনা : বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক সমাজে গরব সন্তানের মতোই লালিত পালিত হয়। শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির এই প্রাণীটি খুব সহজেই পোষ মানে।

দৈহিক গড়ন : গরব আড়াই থেকে তিন হাত উঁচু এবং তিন থেকে পাঁচ হাত লম্বা হয়ে থাকে। এর মাথায় দুটি শিং, দুটি কান, দুটি চোখ, চারটি পা ও একটি লম্বা লেজ আছে। লেজের আগায় এক গোছা চুল থাকে। এই লেজ দিয়ে গরব মশা-মাছি তাড়ায়। এর সারা শরীর ছোট ছোট লোমে ঢাকা। পায়ের খুর দুভাগে বিভক্ত। গরবর মুখের উপরের পাটিতে দাঁত নেই।

বর্ণ : সাদা, কালো, লাল, ধূসর, মিশ্র প্রভৃতি রঙের গরব দেখতে পাওয়া যায়।

খাদ্য : গরবর প্রধান খাদ্য ঘাস। এছাড়া এরা লতাপাতা, ভুসি, খড়, ভাতের মাড় ইত্যাদিও খায়।

উপকারিতা : আমরা গরবর মাংস খাই। গরব আমাদের দুধ দেয়। দুধ দিয়ে ঘি, মাখন, বীর, ছানা ইত্যাদি মজাদার খাবার তৈরি হয়। এর চামড়া দিয়ে জুতা, ব্যাগ এবং শিং দিয়ে বোতাম, চিরবনি ইত্যাদি তৈরি হয়। বেতে লাঙল দেওয়া ও গাড়ি টানার কাজে গরবকে ব্যবহার করা হয়। গরবর গোবর অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের সার।

উপসংহার : গরব অত্যন্ত উপকারী জন্তু। তাই এর যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

৩. ধান

সূচনা : কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ফসল হলো ধান। এটি আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য।

চাষের অঞ্চল : আমাদের দেশে গ্রামের মাঠে মাঠে ধান চাষ করা হয়। হাওর, খাল, বিল এবং নদীর চরেও ধানের চাষ হয়।

বৈশিষ্ট্য : ধানগাছ তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এর পাতা চিকন ও দীর্ঘ। কাঁচা ধানগাছ সবুজ থাকে। ধান পাকলে ধানসহ গাছের রং সোনালি হয়।

উৎপাদন : পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ধান জন্মায়। তবে এশিয়া মহাদেশ বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড ধানের জন্যে বিখ্যাত। বাংলাদেশের বরিশাল ও দিনাজপুর জেলায় বেশি ধান উৎপাদিত হয়। আমাদের দেশে সাধারণত চার প্রকারের ধান উৎপন্ন হয়। যথা– আউশ, আমন, বোরো ও ইরি।

চাষের সময় : আউশ ধান চৈত্র-বৈশাখ মাসে বুনতে হয় এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কাটা হয়। আমন ধান আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বুনতে হয় এবং কার্তিক–অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হয়। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বোরো ধানের চারা রোপণ করা হয় এবং চৈত্র–বৈশাখ মাসে কাটা হয়। ইরি ধানের চাষ বছরের বিভিন্ন সময়ে করা হয়।

ধানজাত দ্রব্য : ধান থেকে চাল হয়। চাল দিয়ে ভাত রান্না করা হয়। এছাড়া চাল থেকে চিঁড়া, মুড়ি, খই ইত্যাদি খাবার তৈরি হয়। ধানের খড় গরব–মহিষের খাদ্য।

উপসংহার : আমাদের দেশের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ধানের উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। চাষাবাদের ৰেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

৪. আমাদের গ্রাম

সূচনা : ‘আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।’

আমাদের গ্রামের নাম ঘোপাল। গ্রামটি ফেনী জেলায় অবস্থিত। গ্রামের একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফেনী নদী।

সৌন্দর্য : আমাদের গ্রামটি ছবির মতো সুন্দর। আম, কাঁঠাল, বটসহ নানা রকম গাছ-গাছালিতে গ্রামটি ঘেরা। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। বিভিন্ন মৌসুমে ফোটে নানা রকম ফুল। গ্রামের মেঠো পথ, সোনালি ধানৰেত, ছায়া ঢাকা বাঁশঝাড় দেখলে মন জুড়িয়ে যায়।

গ্রামের মানুষ : আমাদের গ্রামে প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস। এখানে আছে নানা পেশার, নানা ধর্মের মানুষ। গ্রামের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। কেউ ঝগড়া–বিবাদ করে না।

গ্রামের স্থাপনা : আমাদের গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি লাইব্রেরি, একটি খেলার মাঠ, একটি বাজার, দুটি মসজিদ, একটি মন্দির ও একটি ডাকঘর আছে।

গ্রামের আর্থিক অবস্থা : আমাদের গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। গ্রামের মাঠে মাঠে ফলে প্রচুর ধান, পাট, গম, মসুর, সরিষা, আখ ইত্যাদি। বড় বড় পুকুরগুলোতে নানা রকম মাছের চাষ হয়।

উপসংহার : আমাদের গ্রামকে আমরা সবাই মায়ের মতো ভালোবাসি। গ্রামের উন্নয়নে সবাই মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করি।

৫. আমাদের বিদ্যালয়

সূচনা : “বিদ্যালয়, মোদের বিদ্যালয়,
এখানে সভ্যতারই ফুল ফোটানো হয়।”

বিদ্যালয় হচ্ছে ভালো মানুষ গড়ার কারখানা। আমি যে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করি তার নাম চাঁদগাজী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

অবস্থান : আমাদের বিদ্যালয়টি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার চাঁদগাজী গ্রামে অবস্থিত।

বিদ্যালয় ভবন : আমাদের বিদ্যালয় ভবনটি পাকা। এটি উত্তর–দৰিণে লম্বা। এতে ১০টি কৰ আছে। এগুলোর ভেতর একটি প্রধান শিৰক সাহেবের কৰ, একটি শিৰকদের কৰ, একটি অফিস কৰ এবং একটি লাইব্রেরি কৰ। অন্য কৰগুলোতে ক্লাস হয়ে থাকে।

ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলী : আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২০০। শিৰা দেওয়ার জন্য রয়েছেন ১০ জন সুযোগ্য শিৰক। শিৰকগণ আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পড়ান।

লাইব্রেরি : আমাদের বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটি বেশ সমৃদ্ধ। এখানে নানা ধরনের বই রাখা আছে। লাইব্রেরি থেকে বই ধার করে বাড়িতে নিয়েও পড়া যায়।

খেলাধুলা : আমাদের বিদ্যালয়ের সামনে আছে বড় একটি খেলার মাঠ। এখানে আমরা খেলাধুলা করি। বিদ্যালয়ে একজন ক্রীড়া শিৰক আছেন। তিনি নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা পরিচালনা করে থাকেন।

অনুষ্ঠান : আমাদের বিদ্যালয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের বিদ্যালয়টির বেশ সুনাম রয়েছে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে নানা রকম আয়োজন থাকে।

ফলাফল : প্রাথমিক শিৰা সমাপনী পরীৰায় প্রতিবছর আমাদের বিদ্যালয় থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিসহ আট–দশ জন ছাত্র–ছাত্রী A^+ পায়।

উপসংহার : আমাদের বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরূ প একটি বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।

৬. একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা
অথবা, **একজন বীরশ্রেষ্ঠ**
অথবা, **বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল**

সূচনা : বীরদের ভেতর শ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁরাই বীরশ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বিরবদ্ধে বীরের মতো লড়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। তাঁদের মধ্যে বিশেষ অবদানের কারণে কয়েকজন পেয়েছেন বীরশ্রেষ্ঠের মর্যাদা। বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল তেমনই একজন।

জন্ম পরিচয় : বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল ১৯৪৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার হাজিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হাবিবুর রহমান। তিনি পেশায় সেনাবাহিনীর হাবিলদার ছিলেন।

শৈশব : ছেলেবেলায় মোস্তফা কামাল ছিলেন খুব দুরন্ত। লেখাপড়ায় বেশিদূর এগোতে পারেন নি। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তিনি।

কর্মজীবন : সৈনিকদের সুশৃঙ্খল জীবন মোস্তফা কামালকে সৈনিক হতে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৬৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। প্রশিৰণ শেষে ১৯৬৮ সালে তিনি চতুর্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে নিয়োগ পান।

মুক্তিযুদ্ধে মোস্তফা কামালের অবদান : ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরব হয়, মোস্তফা কামাল তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চতুর্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। এ সময়ে তিনি গঙ্গা সাগরের উত্তরে দরবইন গ্রামে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে যোগদান করেন। ১৬ই এপ্রিল খবর পাওয়া গেল, পাকিস্তানি হানাদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাগণ শত্রব সেনাদের প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হলেন। ১৮ই এপ্রিল সকাল এগারোটায় শুরব হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। আর সেই সাথে মুক্তিবাহিনীর শিবির লৰ্য করে পাকিস্তানি বাহিনীর তুমুল গোলাবর্ষণ। বেলা বারোটায় আক্রমণ আরও তীব্র হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা গুলি তার সামনে কিছুই না। হঠাৎ একজন মুক্তিযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হলেন। মোস্তফা কামাল এক মুহূর্ত দেরি না করে মেশিনগান চালাতে লাগলেন। এক সময় তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গীদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বললেন। কেননা তা না হলে সবার মৃত্যু অবধারিত। সঙ্গীরা তাঁকে রেখে সাবধানে পিছু হটলেন। আর অবিরাম মেশিনগান চালিয়ে মোস্তফা কামাল ঠেকিয়ে রাখলেন শত্রবসেনাদের। একাই যেন হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিবাহিনীর একটি দুর্গ। হঠাৎ শত্রবর গোলার আঘাতে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তিনি শহিদ হলেন। তাঁর জীবনের বিনিময়ে রৰা পেল সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যবান জীবন।

উপসংহার : মোস্তফা কামাল আমাদের গর্বিত সন্তান। দরবইনের মাটিতে সমাহিত হয়ে আছে এই অকুতোভয় বীরের ৰতবিৰত দেহ। তাঁর মনোবল ও আত্মদানের কথা দেশবাসী কোনোদিন ভুলবে না।

৭. একুশে ফেব্রুয়ারি

সূচনা : "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রবয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?"

একুশে ফেব্রবয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনটিতে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আন্দোলন করেছিল বীর বাঙালি। ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ নাম না জানা অনেকে। তাই এই দিনটি আমাদের জন্য একই সাথে গৌরবের ও বেদনার।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপট : ১৯৫২ সালের ২৬ শে জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর প্রতিবাদে বাংলার ছাত্র-জনতা আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রবয়ারি এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূ প লাভ করে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতা মিছিল বের করে। পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালালে নিহত হয় অনেকে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে গোটা দেশের ছাত্র-জনতা। আন্দোলন আরও তীব্র হয়। এর ফলে পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি পালন : প্রতি বছর নানা আয়োজনে এ দিনটি সরকারি ও বেসরকারিভাবে পালন করা হয়। সারা দেশের শহিদ মিনারগুলোতে ভোরবেলা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানো হয়। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এদিন খালি পায়ে হেঁটে শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দেয়।

উপসংহার : একুশ আমাদের অহংকার। এ দিনটি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়িয়ে দেয়। অন্যায়ের বিরবদ্ধে প্রতিবাদের শিৰা দেয়। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দেশের জন্য কাজ করব।

৮. বাংলাদেশের জাতীয় ফুল
অথবা, আমার প্রিয় ফুল

সূচনা : বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। এটি আমাদের দেশের অতি পরিচিত একটি ফুল। এদেশের দিঘি, খাল-বিল, ডোবা ইত্যাদি স্থানে শাপলা ফুটে থাকে। শাপলা আমার প্রিয় ফুল।

বিবরণ : শাপলা হলো একটি লতাগুল্ম ধরনের জলজ উদ্ভিদ। অর্থাৎ এটি পানিতে জন্মায় ও বেড়ে ওঠে। এরা সাধারণত স্রোতবিহীন জলাশয়ে জন্মে। এর মূলটি জলাশয়ের নিচে কাদার ভেতরে থাকে। গোড়া থেকে নল বা ডাঁটা বৃদ্ধি পেয়ে একসময় পানির ওপর ভেসে ওঠে। শাপলার পাতাগুলো গোলাকৃতির এবং বড় বড়। থালার মতো দেখতে পাতাগুলো পানিতে ভেসে থাকে। কুঁড়ি অবস্থায় শাপলা দেখতে অনেকটা কলার মোচার মতো। বর্ষার মাঝামাঝি সময় থেকে শুরব করে শরৎকালের শেষ অবধি এ ফুল ফুটতে দেখা যায়। আমাদের দেশে সাদা, লাল ইত্যাদি রঙের শাপলা ফোটে। তবে সাদা রঙের শাপলাই আমাদের জাতীয় ফুল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সৌন্দর্য : সুগন্ধ না থাকলেও শাপলা দেখতে খুবই সুন্দর। বর্ষাকালে বিলে-ঝিলে ফুটে থাকা শাপলা দেখে মন ভরে যায়।

ব্যবহার : শাপলা ফুল দিয়ে শিশুরা মালা গাঁথে। এর ডাঁটা তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। শাপলার শেকড় বা শালুক পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে খাওয়া হয়।

উপসংহার : শাপলা আমাদের জাতীয় প্রতীক। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম উপাদান।

৯. বাংলাদেশের পাখি

সূচনা : পাখিরা বাংলাদেশের প্রকৃতির গুরবত্বপূর্ণ অংশ। ভোরবেলা পাখির কলকাকলিতে আমাদের ঘুম ভাঙে। বাংলাদেশে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য পাখির অবস্থান থাকায় এ দেশকে বলা হয় পাখির দেশ।

পাখিদের বৈচিত্র্য : বাংলাদেশে প্রায় ৬৪টি প্রজাতির ৬০০ রকমের পাখির বাস। এর মধ্যে ৪০০ রকমের পাখি সারাবছর বাংলাদেশে অবস্থান করে। আর বাকিরা শীতের সময়ে অতিথি হয়ে এদেশে আসে। এখানে বাংলাদেশের নানা রকম পাখির পরিচয় তুলে ধরা হলো–

লোকালয়ের পাখি : লোকালয়ের পাখি বলতে আমরা বুঝি যেসব পাখি মানুষের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে তাদেরকে। এসব পাখির মধ্যে উলেৱখযোগ্য হলো কাক, বুলবুলি, চড়ুই, কোকিল, টুনটুনি, বাবুই,

শালিক ইত্যাদি। এদের ভেতর দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। এ পাখিগুলো সাধারণত কীটপতঙ্গ, ফুলের মধু ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

বুনো পাখি : যে সকল পাখি সচরাচর লোকালয়ে আসতে পছন্দ করে না তাদেরকে বুনো পাখি বলে। যেমন– ফিঙে, আবাবিল, বাঁশপাতি, বেনে বউ, জলময়ূর প্রভৃতি।

জলচর পাখি : জলচর পাখিদের বিচরণ পুকুর, খাল–বিল ইত্যাদি স্থানে। এদের মধ্যে বেশি চোখে পড়ে মাছরাঙা, বক, পানকৌড়ি ইত্যাদি। ছোট মাছ, শামুক, গুগলি ইত্যাদি এদের প্রিয় খাবার।

অন্যান্য পাখি : উপরে উলিরখিত পাখিগুলো ছাড়াও আমাদের দেশে রয়েছে আরও অনেক পাখি। যেমন : টিয়া, ধনেশ, শ্যামা, ডাহুক, ঘুঘু, ময়না, শকুন, গাঙচষা ইত্যাদি। ময়না ও টিয়া পাখিকে মানুষ শখ করে পোষে।

উপকারিতা : পাখিরা নানাভাবে আমাদের উপকার করে। চড়ুই, টুনটুনি, বুলবুলি ইত্যাদি পাখি ফসলের ৰতিকর পোকামাকড় খেয়ে কৃষকের উপকার করে। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে পাখিরা পরাগায়ণে ভূমিকা রাখে। কাক, শকুন ইত্যাদি পাখি ৰতিকর বর্জ্য খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে।

উপসংহার : পাখিরা আমাদের পরম বন্ধু। পরিবেশের ভারসাম্য রৰায় এদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরবত্বপূর্ণ। আমরা বন্ধুর মতো এই পাখিদের ভালোবাসব, তাদের রৰা করব।

১০. মা/আমার মা/ আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব

সূচনা : ‘হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ।’

আমাদের সবার জীবনে ‘মা’ একটি মধুমাখা নাম। পৃথিবীতে তিনিই সন্তানের সবচেয়ে আপনজন। আমিও আমার মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা : পৃথিবীতে মায়ের কাছে সবচেয়ে দামি তাঁর সন্তান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সকল ভাবনা সন্তানদের নিয়ে। সন্তান কিসে ভালো থাকবে, নিরাপদ থাকবে– তিনি সবসময় কেবল সে ভাবনাই ভাবেন। মায়ের দোয়া পেলে সন্তানের দুঃখ দূর হয়। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়।

আমার মা : আমার মা আমাকে অনেক স্নেহ করেন। সবসময় কাছে কাছে রাখেন। আমার অসুখ করলে মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। রাত–দিন জেগে তিনি আমার সেবা করেন। আমার খুশির জন্য যা যা করা দরকার তার সবই মা করেন।

বন্ধু হিসেবে মা : মা আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমি মায়ের কাছে কোনো কিছুই গোপন করি না। তিনি আমার সব ভালো কাজে উৎসাহ দেন। মন্দ কাজ করলে বুঝিয়ে বলেন। কখনোই বকুনি দেন না। মায়ের কাছেই আমার যত আবদার।

অভিভাবক হিসেবে মা : মা আমাকে মানুষের মতো মানুষ হতে বলেন। তিনি আমার সেরা শিৰক। আমার পড়া তৈরিতে মা সাহায্য করেন। কঠিন বিষয়গুলো মা খুব সহজেই বুঝিয়ে দেন।

উপসংহার : মা-ই আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। আমি মাকে কষ্ট দিই না। নানা কাজে তাঁকে সাহায্য করি। সবসময় তাঁর কথামতো চলতে চেষ্টা করি।